ISSN: 2584- 0738 (Online)
Criticality
Vol. 02, No. 02, December 2024, pp. 64 - 74
Activism Foundation
for Social Research & Action

তত্ত্ব এবং প্রয়োগের অন্তর্বর্তী সমাজবিজ্ঞান[1]

সমীর কুমার দাস[2]
প্রস্কন্দন সেনগুপ্ত[3]

সারসংক্ষেপ:

সমাজবিজ্ঞানের চর্চায় আমরা যখনই Practicalities of Social Science, এই শীর্ষক কোন আলাপ শুরু করি, আমাদের একধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধা মূলত আসে আমাদের ভাষাগত দিক থেকে। কারণ, practicalities শব্দটির কোনো উপযুক্ত পরিভাষা আমাদের সমাজবিজ্ঞানে নেই। Practicalities শব্দটির যদি আক্ষরিক অনুবাদ করি অর্থাৎ শব্দার্থ খুঁজতে যাই, তাহলে যে শব্দটি উঠে আসে, সেটি হলো – 'ব্যবহারিকতা'। কিন্তু, ব্যবহারিকতা শব্দটি আমাদের সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গনে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অর্থ তৈরি করতে পারে কারণ এটির সঙ্গে behaviour বা আচরণ শব্দটির অনুষঙ্গ এসে যায়। বিহেভিয়ার শব্দটি একটি নির্দিষ্ট ধারার সমাজবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসকে নির্দেশ করে যা আচরণবাদ নামে অখ্যাত হয়। শব্দটি নিজে একটি নির্দিষ্ট ধরনের রাজনীতিরও দিক নির্দেশক তাই স্বভাবতই, বিহেভিয়ার বা ব্যবহারিকতা শব্দটি ব্যবহার করে আজকের আলোচনাটিকে সংকীর্ণ করে তুলবোনা। বরঞ্চ, practicalities শব্দটির ভাবার্থ হিসেবে 'প্রায়োগিকতা' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। সমাজবিজ্ঞানের আলোকে প্রযোগিকতা বললেই উঠে আসে আমাদের সমাজএবং সেই তত্ত্বের প্রয়োগ অথবা প্রয়োগের সম্ভাবনা।

তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগ শব্দটি সাধারণত সমাজবিজ্ঞানের আঙিনায় দুটি যুযুধান শিবিরের মতো অবস্থান করে। একদিকে, শুধু, ' তত্ত্ব করা' বা তত্বায়ণ যা আপাত ভাবে বেশ নীরস। এই নীরস তত্ত্ব বিষয়টি কিরকম? এটি কি শুধুই তত্ত্বের উৎপাদন ? নাকি বাস্তবতার সম্মুখে তাত্ত্বিক কোনো নিদান? সুকুমার রায়ের আবোল তাবোলের

[1] আমন্ত্রিত প্রবন্ধ; প্রবন্ধটি ২৪ শে মার্চ ২০২৪ এ ICMARD প্রেক্ষাগৃহে অ্যাক্টিভিজম ফাউন্ডেশনের নবম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত "তত্ত্ব এবং প্রয়োগের অন্তর্বর্তী সমাজবিজ্ঞান" শীর্ষক 'প্রতিষ্ঠা দিবস ভাষণের' মার্জিত রূপ

[2] অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

[3] শিক্ষক, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

(রায়, ২০১৮) অন্তর্গত 'নোটবই' ছড়াটি এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।সুকুমার রায়ের লেখনীর মধ্যে যে এক প্রকার সরেসশ্লেষ লুকিয়ে রয়েছে তা প্রত্যহিকতা এবং নোটবই দুইয়ের মধ্যে একধরনের বাইনারি তৈরী করে। তত্ত্ব এবং আমাদের যাপনবিশ্ব দুটি মুখোমুখি দুই যুযুধান পক্ষ। সমাজের ক্ষুদ্র এক পণ্ডিত গোষ্ঠীর কাছে এই নোটবুক অর্থাৎ তত্ত্বের বাইরে যাপন বিশ্বের স্বাধীন অবস্থান বলে কিছু নেই। এই মননের যে বিশ্ব যা মূলত তত্ত্ব থেকে আহরিত তাই যাপন বিশ্বের নির্মাতা। তাই, আমাদের যাপনের আদ্যোপান্ত চিনতে শেখায়। এর ফলে, তত্ত্ববিশ্বকে যাপন বিশ্ব হিসেবে গুলিয়ে ফেলার বিপদে পড়ি। এই দলের মধ্যে কতিপয় সদস্য আছেন যাঁরা মনে করেন, পাশ্চাত্যের এই জটিল তত্ত্ব গুলোকে সহজপাচ্য করে ওষুধের পুড়িয়ার মত পরিবেশন করতে পারলে দেশের উপকার হয়; সবার তত্ত্বপাঠের দরকার পড়েনা। এই কাজে তাই অনেকেই ব্রতী হয়েছেন। মূলত, পাশ্চাত্য রাষ্ট্র তত্ত্বের ক্ষেত্রেই এই রকম পুড়িয়া তৈরী করার প্রাবল্য লক্ষণীয়। এই কাজ পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। যদিও এই বিষয়টির মধ্যে এক ধরনের বিপদ চেপে বসে থাকে। এই যে তরলায়িত তত্ত্ব যাকে পুড়িয়া হিসাবে পরিবেশন করা হচ্ছে তা ক্রমাগত একধরনের যান্ত্রিকতার জন্ম দেয়, যেটি তত্ত্বের উগরে দেওয়ার পথকে ত্বরান্বিত করে। তত্ত্বের উপর এই ধরনের পৌরোহিত্য বা পুরোহিততন্ত্র অত্যন্ত ক্ষতিকারক। যদি আমাদের বুঝবার বা আয়ত্ত করবার মতো ক্ষমতা থাকে তাহলে আমি সেই তত্ত্ব পাঠ করবো। সেই পাঠের নির্যাস ব্যক্তিগত পর্যায়ে সক্ষমতা অনুযায়ী গৃহীত হবে। এই সমজাতীয় কাজ পুড়িয়া সেবন করে হয়না।

এই তত্ত্ব বিশ্ব এবং তার যাবতীয় বাদ-বিবাদের সম্পূর্ণ উল্টো দিকে আরেক ধরনের অবস্থান রয়েছে। সেখানে, প্রয়োগ হলো শেষ কথা। অর্থাৎ, মনন বিশ্বের নির্মাণ, প্রয়োগ বাস্তবের মাটিতে।একটি বক্তৃতায়, প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী আশীষ নন্দী ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে ছিলেন। সেখানে, তাঁর মূল আক্ষেপের সুর লুকিয়ে ছিল এই বিষয়ে যে, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুনত্বের আঙিনা গুলো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার প্রান্ত থেকে উদ্ভূত হয়নি। বরঞ্চ, সম্পূর্ণ অন্যধরনের বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত কিছু প্রতিষ্ঠান এই আঙিনা উন্মোচনে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে, সমাজবিজ্ঞানের বেশ কিছু অভিমুখ আমাদের সামনে খুলে গেছে। এই প্রতিষ্ঠান গুলি শ্রীনন্দীর ভাষায় হলো unusual repositories of knowledge। একটি উদাহরণ দিলে, এই প্রতিষ্ঠানের চেহারা আরেকটু স্পষ্ট হবে। উত্তরবঙ্গে কর্মসূত্রে একটি গ্রন্থাগারে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। সেখানে স্থানীয় যে বিধায়ক তিনি গ্রন্থাগারের আপাত বিস্মৃত হয়ে থাকা ধুলোয় ঢাকা বই পত্রিকা উৎসাহ ভরে দেখাচ্ছিলেন। আমি নিজেই চমকে উঠি, গ্রন্থাগারের সংগ্রহ দেখে। পুরোনো প্রবাসীর প্রায় সব কটি সংখ্যা সাজানো রয়েছে। কিন্তু অর্থাভাবের মলিনতা সবটুকুকে ঢেকে রেখেছে। আমি যখন বেড়িয়ে আসছি, এরম সময় ওনারা আমায় অনুরোধ করেন যে যাওয়ার আগে যেন ভিজিটরস বুকে সাক্ষর করে যাই। আমার সামনে বড় একটি খাতা আনা হলো। যা আপাদমস্তক কাঠ বাঁধাই করা। আমি নিজের কৌতূহলে প্রথম পাতা থেকে দেখতে শুরু করলাম। দেখলাম, মহাত্মা

গান্ধী থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকের সাক্ষর রয়েছে খাতায়। আমি বাধ্য হয়ে বললাম আমায় একটি সাধারণ খাতা দিন, আমি সেখানে ভিজিটর হিসেবে সাক্ষর করে যাচ্ছি কিন্তু এনাদের পাশে আমি সই করতে অপারগ। এই যে গ্রন্থাগারের বর্ণনা দিলাম, এটি হলদিবাড়ি অঞ্চলের। প্রাক স্বাধীনতা আমলে হলদিবাড়ি থেকে রংপুর অবধি রেল পথে যোগাযোগ ছিল। যার ফলে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতা কর্মীরা ওই রাস্তা ধরে রংপুর যেতেন রাজনৈতিক সভা এবং কার্যের দরুন। এখন, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গুলোকে আমরা বলতে পারি unusual repositories। অর্থাৎ, প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনিক চর্চা কেন্দ্রের বাইরে সুপ্ত বা অপ্রচলিত জ্ঞানকুণ্ড।

এই যে প্রয়োগ বিশ্ব যার একটি আধার হলো unusual repositories। এসবের বাইরেও একটি তৃতীয় পরিসর রয়েছে। এই গোষ্ঠীটি অপেক্ষাকৃত দলে ভারী। এই পথে, যাঁরা আছেন তাঁরা তত্ত্ব এবং প্রয়োগ কোনো পথেই এগোন না। বরঞ্চ, তত্ত্বের সমুদ্রে ডুব না দিয়েই এবং অপরদিকে প্রয়োগের পথে না হেঁটে সহজপাচ্য জ্ঞান সংগ্রহ করার কাজে রত থাকেন। এই ধরনের সমাজবিজ্ঞান খুবই জনপ্রিয় আঞ্চলিক স্তরে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি প্রার্থী যেকোন সাধারণ ছাত্রকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে পত্রগুলো (Paper) এতদিন পড়ানো হলো, সেইগুলোর মধ্যে তোমার পছন্দের পত্র (Paper) কোনটি? তাহলে দেখা যাবে, দশজনের মধ্যে অন্তত আটজন ছাত্রই বলবে রাষ্ট্রতত্ত্ব পলিটিক্যাল থিওরি তার প্রিয় পত্র। তাহলে, তত্ত্বের বাজার কি আদতেই এত গরম? নাকি, তত্ত্ব চর্চা নয় বরঞ্চ তরল তত্ত্বের গলাধঃকরণ এই ভাঙ্গা বাজারে বেশি জনপ্রিয়। এই ছাএকুলদের সঙ্গে একটু আলাপ চালালে দেখা যাবে, পলিটিক্যাল থিওরি আদতে কতগুলো মুখস্ত করে উগড়ে দেওয়ার মতো মতো নিরেট গোলাকার খাদ্যপিণ্ড। যার ফলে এটির প্রতি ভালোবাসা অনেক বেশি। পরিশ্রম কম। ব্যবহারিক প্রতিফলন শূন্য। অপরদিকে প্রয়োগের যে যাপন বিশ্ব তা ততোধিক জটিল। এখানে তত্ত্বকে বোঝার একটি দিক রয়েছে; আবার সেই তত্ত্ব কেই এক পাশে সরিয়ে যাপনের মধ্যে দিয়ে তত্ত্ব কে চিনবার এক কঠোর যাত্রা রয়েছে। এই " বাজারে" তরল তত্ত্বের কাছে যেহেতু প্রয়োগের কোনো চাহিদা নেই তাই, একবার গলাধঃকরণ সম্পন্ন হলে আমি ওটাকে স্বচ্ছন্দে তাকবন্দি করে রাখতে পারি।এই নিয়ে চর্চার কোন প্রয়োজন নেই। বিষয়টিকে আরেকটু উদাহরণ সহযোগে ভাবা গেলে এই সংকটটা আমাদের চোখে আরেকটু পরিস্কার হবে। রাষ্ট্র তত্ত্বের যে বিভিন্ন ধারা রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় একটি ধারা হলো, সামাজিক চুক্তি মতবাদ। সোজা কথায়, এই ধারার দার্শনিকরা মনে করেন, রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও তার যাত্রাপথে আমরা রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রদর্শন করবো কেবল মাত্র কত গুলো শর্তের বিনিময়ে। অর্থাৎ, জনগণ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এক ধরনের চুক্তি কাজ করে। দার্শনিকদের মতে এই শর্তগুলো হলো, আমায় জীবন ধারণের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষা করার স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই যে, অধিকার গুলির বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রদর্শন এটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক ধরনের অলিখিত চুক্তি। এই ধারার একজন প্রবাদ প্রতিম দার্শনিক হলেন, জন লক। যদি, আমি কোনো ছাত্র কে জিজ্ঞেস

করি, যে আমরা কি ভারতীয় সংবিধান কে সামাজিক চুক্তির আলোকে ব্যাখা করতে পারি? কারণ, আমাদের দেশের সংবিধানে তো আমরা সেই সার্বভৌমকে ক্ষমতায় আনিনা যার চেহারা টা সামুদ্রিক দানবের (লেভিয়াথনের[১]) মত।সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'আমরা ভারতের জনগন' – এই শব্দবন্ধ নিয়ে বিগত কয়েক বছরে অনেক গবেষণা হয়েছে[২]। এই জনগন কতকগুলি সাংবিধানিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রথিত – এদের কোনক্রমেই 'জাতি' বলা যাবেনা। আবার অনেকে মনে করছেন ভারতবর্ষের মতো বহুধাবিভক্ত সমাজে জনগন শব্দটির কোন দৃঢসংবদ্ধ অর্থ নেই।এই জনগন কতকগুলি সম্প্রদায়-কৌমে বিভক্ত। রাষ্ট্র তত্ত্ব এবং সংবিধানকে পাশাপাশি রাখলে এই ব্যতিক্রমী চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।কিন্তু, যাদের এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হলো, তারা এই বিষয়টি কোনো দিনও অনুধাবন করতে পারেন না যে লক বা রুশো দিয়েও আমরা আমাদের দেশের সংবিধানকে পাঠ এবং সমলোচনা করতে পারি। কিন্তু, প্রায়োগিক বিশ্বের অর্থাৎ যাপনকে বুঝবার যে জটিলতা তাকে অনুধাবন করার ক্ষমতা এই তৃতীয় দলের নেই।

কিন্তু, প্রশ্ন হলো, প্রথম যে দুই দল, অর্থাৎ তাত্বিক এবং প্রায়োগিক এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে সংকট সেখান থেকে আশু পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই।এখন যদি তত্ত্বের রাস্তায় এগোতে চাই , তাহলে সাদা চামড়া ব্যতীত এই রাস্তায় হাঁটার অনুমতি পাওয়া যাবেনা। বেশ কিছু দিন আগে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল থিওরির ওপর তরুন একদল গবেষকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা হলো প্রায় তিনদিন ব্যাপি। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এখানে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো ছাত্র বা ছাত্রী নেই যিনি ওখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছেন। অর্থাৎ, তত্ত্ব নির্মাণ প্রকল্পে অশ্বেতাঙ্গদের কোন ভুমিকাই নেই বা আরো সোজা করে বললে তত্ত্ব উৎপাদক কেবল মাত্র সাদা চামড়ার দ্বারাই সম্ভব। এই শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর যে কৌম গোষ্ঠীর বাইরে আমরা যারা শুধু নেটিভ ইনফরম্যান্টের কাজ করবো। এই যে বৈষম্য মূলক শ্রম বিভাজন সেখানে আমাদের ভূমিকা হলো , rag - pickers of the Global South। আমরা প্রাত্যহিক জীবনের আস্তাকুড় ঘেঁটে সর্বদা শ্বেতাঙ্গদের যোগান দেবো। এখানে, এই যে আমরা, অর্থাৎ 'অপর' জনগোষ্ঠীর যে অংশ তারা ধরেই নিয়েছি, তত্ত্বের স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের কাজ আমাদের নয়। এই যে শ্রম এবং ক্ষমতার বিভাজন সেটি একধরনের সামাজিক ক্ষমতার বিভাজনের কাঠামোকে সুস্পষ্ট করে তোলে। অধ্যাপক গোপাল গুরু এবং সুন্দর সারুকাই এই বৈষম্যমূলক কাঠামোকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, 'Theoretical Brahmins' এবং 'Practical Shudras' (Guru & Sarukai, 2012)। ব্রাহ্মণ্যবাদী শুচিতার মতোই তত্ত্ব তৈরী করার অধিকারী ভেদ রয়েছে সমাজবিজ্ঞানের ধারায়। উল্টো দিকে আরেকটা বিপদ রয়েছে। একদলের কাছে ক্ষেত্রসমীক্ষার স্বতঃস্ফূর্ততা হলো সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পাথেয়। 'একশন' অর্থাৎ প্রচলিত সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় 'ফিল্ডওয়ার্ক' হলো শেষ কথা। লেনিনের What is to be done (লেনিন, ১৯৫৫) পড়লে দেখা যাবে, সেখানে উনি এক ধরনের তত্ত্ববর্জিত স্বতফুর্ততার সমালোচনা করছেন[৩]। লেনিনের কাছে পার্টির

কর্মীদের এই প্রবণতা ফ্যাসিবাদী বা একনায়কতান্ত্রিক রাজনৈতিক ঝোঁক হিসাবে উঠে এসেছে। মননের যে বিশ্ব অর্থাৎ, তত্ত্বের দিক টিকে সম্পূর্ণ খারিজ করে প্রয়োগবিশ্ব দিয়েই আলোচনাটিকে বেঁধে ফেলার এই বিপদ সব সময় এই স্বতঃস্ফূর্ততার আতিশয্য এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রাত্যহিক 'কমন সেন্স' থেকে উঠে আসে। তাহলে তত্ত্ব এবং প্রযোগবিশ্ব নিয়ে যে সমস্যা দুটি উঠে এলো সেখান থেকে পরিত্রাণ পাবো কি করে?

তাহলে, পরিত্রাণ বললেই খুব স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসবে এক নির্দিষ্ট আনুপাতিক মেলবন্ধনের কথা যেটি প্রয়োগবিশ্ব এবং তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে নির্মিত হয়।কিন্তু, এই প্রয়োগ এবং মননের বিশ্বকে মেলানোর বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। সব থেকে বড় কথা হলো, এই পথে, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক এক সন্ধিক্ষণের সঙ্গে তত্ত্বের যে শর্তাবলী তার এক সন্ধি ঘটবে। স্বভাবতই, বিষয়টি খুব জটিল। বরঞ্চ, এই তত্ত্ব এবং প্রয়োগবিশ্ব, তার মধ্যে যে ব্যবধান সেটিকে বোঝার চেষ্টা করা যায়। এই যে in-between অংশটি রয়েছে, এটিই প্রয়োগ এবং তত্ত্বের অন্তর্বর্তিতার ভাঁজগুলো চিনতে সাহায্য করে। মেলবন্ধনের যে কথাটি একটু আগেই আলোচিত হলো, সেই মেলবন্ধনের স্থানিক যে সূচক, সেটিকেই আমরা in-between হিসেবে পাঠ করতে পারি। এই আলোচণাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত কিছু গবেষণা এবং পাঠের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবো।

জঁ-লুক ন্যান্সি, ফরাসী দার্শনিক, তাঁর Being Singular Plural (Nancy, 2000)বইতে বলছেন যে, এই অন্তর্বর্তী অংশ এটি তত্ত্বও নয়, আবার প্রয়োগও নয়। বরঞ্চ সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিষয়। আমি তিনটে গল্প আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। দুটি গবেষণার দ্বারা আহরিত এবং একটি পাঠের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। তাহলে এই যে আলাদা "বিষয়" বা in-between এইটার একটা কাঠামো বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মালদার মানিকচক ব্লক এলাকার অধিকাংশ অংশ ক্রমাগত গঙ্গার গর্ভে চলে যাচ্ছে। মালদার বিষয়ে যাঁরা খোঁজ রাখেন তাঁরা জানেন এই ভাঙ্গন বহুদিন ধরে হয়ে চলেছে। ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল অবধি ২৪৭ হেক্টর জমি গঙ্গা গর্ভে চলে গেছে। এই যে জমি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হচ্ছে সেখানে বানভাসী মানুষ তো বিস্থাপিত হচ্ছেনই, সেই সঙ্গে তাঁদের চাষের জমি, মন্দির মসজিদ এবং স্থানীয় যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সেইগুলি ক্রমাগত গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে। ২০০৪ সাল থেকে ২০১১ সাল অবধি গবেষণার দরুন এই অঞ্চলগুলোতে আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। এরকম সময়ে, বর্ষান্নাত একদিনে আমি পশ্চিমবঙ্গের সেচ (ইরিগেশন) দপ্তরের মালদাস্থিত অফিসে বসে আছি। অন্তত সেই সময় অবধি, সেচ দফতর এই বিষয়গুলি সামলাত। চারদিকে প্রবল বৃষ্টি। সেচ দফতরের যিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার অফিসে ক্রমাগত বিভিন্ন জায়গা হতে ফ্যাক্স কিংবা ফোন আসছে যে, মালদার বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হচ্ছে। এরকম সময়ে, প্রায় বৃষ্টিস্নাত হয়ে ২৫-৩০ জনের একটি মিছিল অফিসে আসে। তাঁদের হাতে মিছিলের একটা বড় ব্যানার ঝুলছে। সেখানে লেখা রয়েছে, গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ নাগরিক একশন কমিটি। প্রবল উত্তপ্ত বাদানুবাদ চলছে তাঁদের তরফ থেকে। এরকম সময় মিছিল থেকে কয়েকজন নেতৃ স্থানীয় উঠে এলেন, চিফ

ইঞ্জিনিয়ারের অফিস ঘরে। আমি ঘরের এক কোনায় বসে আছি। তাঁরা প্রবেশ করেই তাঁদের তরফ থেকে আপাতভাবে বেশ অযৌক্তিক কয়েকটি দাবি জানালেন । তাঁরা বললেন, গঙ্গার পারের যে ভাঙন হচ্ছে হতে দিন। গঙ্গার পার যতই জলমগ্ন হোক বা বিলীন হোক, এই বন্যাকে রোধ করা থেকে বিরত থাকুন।অপর দিকে, যিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তিনি প্রতুত্তরে বলে উঠলেন, আপনারা কি আমায় ইঞ্জিনিরিয়ারিং শেখাবেন? আমার একটা ডিগ্রী আছে? আপনাদের আই কিউ কত? এরকম বাদানুবাদের উত্তরে, তাঁরা বললেন, আমরা চাই বন্যা হোক কারণ গঙ্গা বাহিত যে পলি সেইটা বন্যাকবলিত জমির উর্বরতা বাড়াবে। আর এই যে সেচ দফতর থেকে বোল্ডার ফেলে পাথর লোহা লক্কর সহযোগে গঙ্গাকে বাঁধার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা একটা বৃথা চেষ্টা। এই যে পাথর লোহা লক্কর ফেলা হচ্ছে এর ফলে নদীর যে রিভার বেড বা নদীর পৃষ্ঠ দেশ সেটা ক্রমশ আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে। নদী হারাচ্ছে তার গভীরতা। অন্যদিকে, গঙ্গা যে পলি নিয়ে আসছে হিমালয় থেকে এর ফলে ফারাক্কা ব্যারেজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এই যে ব্যারেজ দিয়ে নদী কে আটকাচ্ছেন, তাতে ক্ষতি হচ্ছে।নদী গভীরতা হারালে বর্ষাকালে বিপুল জলধারা নদীখাত উপছে ব্যপক এলাকা প্লাবিত করছে।এক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর ভাষায়, 'সাপের ফনাটাকে চেপে ধরলে সে তো ছটফট করবেই'। গঙ্গার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। পলি জমে গেছে। উদ্বৃত্ত জলরাশির নদীর পার ভাঙ্গা ছাড়া গত্যন্তর নেই।বস্তুতপক্ষে, যাঁরা এই বিষয়ে অবগত আছেন, তাঁরা জানেন, মালদায় গঙ্গা নিজের খাত ছেড়ে অন্য খাত দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গরমের সময়ে যদি মালদার গঙ্গায় নৌকাবিহারে যাওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে নদী বিভিন্ন খাতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এটির ফলে, এক জায়গায় প্রায় ১৪ কিলোমিটার মতো চওড়া নদীর আকৃতি দেখা যায়।

এই কথোপকথন লক্ষ্য করলে দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রথমত, গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে অভিবাসী মানুষ ক্রমশ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তাদের বসত উঠিয়ে নিয়ে যায়। কারণ, তাঁদের যে স্থানিক জ্ঞানের পুঁজি, তার থেকে তাঁরা জানেন যে, গঙ্গার জল চক্রাকারে ঘোরার ফলে মাটির তলা ক্ষয়ে গেলেও উপরিভাগ অবিকৃত থাকে। নদীর যে নীরব গর্জন সেটা তাদের দোলা দেয়। তাঁরা সেটি শুনতে সক্ষম।এই ধরনের স্থানিক জ্ঞান কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার শুনতে নারাজ।প্রতিষ্ঠানিক জ্ঞানকাঠামোর এই যে প্রত্যাখ্যান এটাকে ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের ভাষা ধার করে বলতে পারি এটি হলো Subaltern knowledge apartheid[৪]। অথচ এই যে স্থানিকজ্ঞান এটি কিন্তু প্রয়োগের একটি ব্যবহারিক দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে। সেইসঙ্গে তত্ত্ব বিশ্বের যে বাঁধা কাঠামো তাতে আলোকপাত করার কাজ চালিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এই যে তত্ত্ব সেটি তাহলে আসলো কোথা থেকে? বা একটু অন্য ভাবে প্রশ্নটি উত্থাপন করলে বলা যায়, এই যে প্রায়োগিক জ্ঞান এখানে আরোপ করা হলো, তার তত্ত্বগত সূত্র কী? কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় হলো, এই প্রশ্ন গুলো এখানে উঠবেনা কারণ, তত্ত্ব নির্মাণের পেছনে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে। যেখান থেকে তত্ত্বের স্বর উঠে আসে। কিন্তু, এখানে তো প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ছায়া সেই অর্থে প্রতিফলিত হচ্ছেনা। তাহলে এই যে মানুষগুলির প্রায়োগিক জ্ঞান সেটাকে কি বলব? কমন সেন্স বা সাধারণ জ্ঞান? এই প্রশ্নে

একটু পরে ফিরে আসছি। তত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক দিকে তাকালে দেখব, এই যে ইঞ্জিনিয়ার যিনি নিদান দিচ্ছেন গঙ্গার ভাঙন রোধ করার, তিনি একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে তার প্রায়োগিক জ্ঞান ব্যবহার করছেন। যেটা উন্নয়নের ভাষ্যে এই বাদানুবাদে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু, তিনি যে সমাধান দিচ্ছেন সেটা একদিক থেকে খন্ডিত জ্ঞানের প্রতিফলন। তিনি নিজেই এই বিষয়ে অবহিত আছেন যে, এই যে লোহা লক্কর পাথর সহযোগে পার বাঁধা হচ্ছে সেটা ক্ষণস্থায়ী দাওয়াই। কারণ, প্রমত্ত নদীর সামনে এই গুলো খড়কুটো হয়ে ভাঙন আটকাতে সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষম। কিন্তু তিনি যে নদীবিজ্ঞান শিখেছেন, সেই ডিসিপ্লিনের মধ্যে তাকে বিকল্প কিছু শিখতে বা ভাবতে শেখায় নি। অপর দিকে, এই যে কমন সেন্স বা সাধারণ জ্ঞানের কথা আগে উল্লেখ করা হলো, সেটাও খন্ডিত। সিস্টেমেটিক জ্ঞান যেভাবে প্রতিভাত হয় কমন সেন্সের চলন কিন্তু একেবারেই সেরকম নয়। এই যে গল্পটি সেটি আরেকটু এগোলে কমন সেন্স নিয়ে বিষয়টি আরেকটু বিশদে আলোচনা করা যাবে। এই যে মিছিলের দলটি এসেছিল তাদের একজন নেতা হলেন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী। তিনি বলছেন যে, পার্টির তরফ থেকে তাঁকে বলা হচ্ছে এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থ নিয়ে ভাবছো কেনো, এটা তো ভোটের রাজনীতির অংকে নগন্য। কারণ, ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা কম। তিনি পার্টি কে জানান তিনি এটা নিয়েই এগোবেন। এখন পার্টি পরেছে দোটানায়। পার্টি যদি এই ব্যক্তিকে বহিষ্কার করে তাহলে এই কটা ভোটও পার্টি পাবেনা। অর্থাৎ, এই যে প্রায়োগিক জ্ঞান থেকে আহরিত সাধারণ জ্ঞান বা কমন সেন্স গ্রামসির মতে এই সাধারণ জ্ঞান সেটাকে সাধারণীকৃত করতে হবে যাতে এটা কোনো সংকীর্ণবাদী রাজনীতির থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এই কাজের জন্য এক বিশেষ ধরনের তাত্বিকদের প্রয়োজন যারা, এই প্রযোগিকতাকে সংহত করতে পারবেন। যাতে, এই জ্ঞান বিখন্ডিত হয়ে না পরে। গ্রামসি কে এইভাবে পাঠ করলে তাঁকে অন্তর্বর্তীতার চিন্তক (thinker of betweeness) হিসাবে দেখা যায়।

দ্বিতীয় গল্পটি একটি পাঠের অভিজ্ঞতা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস (মুখোপাধ্যায়, 2014) নামে একটি বই আছে, যেটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যে সিলেবাস তার মধ্যেই আবদ্ধ। জনগণের প্রচার বিমুখ বই বলা যেতে পারে। বইটির নামটি বেশ অদ্ভুত – 'স্বপ্নলব্ধ'। ইতিহাস তো আর্কাইভ থেকে উঠে আসে বা মাঠ ময়দানে ঘোরাঘুরি করলে লেখা যেতে পারে। 'স্বপ্নাদেশ' থেকে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি আজ পর্যন্ত জানা যায়না। এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। বইটির বিষয়বস্তু হলো তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অর্থাৎ বইটির রচনাকাল থেকে প্রায় ১৩৫ বছর আগে একটি ঘটনা নিয়ে লেখা হয়েছে। আমরা ইতিহাসের পাঠ্য বই থেকে অবগত আছি যে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল আফগানিস্থান থেকে আগত আহমেদ শাহ আবদালি এবং পেশোয়ার মধ্যে। ভারতবর্ষের অনেক নবাব নাজিম সেই সময়ে আবদালির সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে পেশোয়া একা হয়ে পড়েন এবং পরাজিত হন। ভূদেব তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ' গ্রন্থে দেখাচ্ছেন যে, যদি সকল ভারতীয় শাসকরা এক জোট হতেন তাহলে ফলাফল অন্যরকম হলেও হতে পারতো। পানিপথের কাছেই, দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থে সকল রাজারাজরা একত্র

হয়ে ঠিক করলেন, যা ঘটে গেছে তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই জন্য তাঁরা একত্র হয়ে লড়াই করবেন যেকোনো বৈদেশিক শক্তিকে প্রতিহত করতে। এই যে বিকল্প ইতিহাস ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখছেন, এটি তিনি কী করে লিখছেন? ভুদেবের ভাষায়, "পাঠ নিবৃত্ত করিয়া ওই পানিপথের যুদ্ধ অন্যভাবে পরিসমাপ্তি হইলে কি হইতো এই বিষয়ে ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীরের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিলো।সুস্থ হইবার মানষে শয়ন করিলাম।নিদ্রাবস্থাই যে কত স্বপ্ন দেখিলাম তাহা অনুপূর্বিক মনে নাই।কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি কয়েক খণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে"।

সুতরাং, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে এটুকু স্পষ্ট যে, জেগে থাকা এবং ঘুমানো এই দুয়ের মাঝে থাকার অভিজ্ঞতাকালে তিনি এই বিকল্প ইতিহাসের খোঁজ পাচ্ছেন। এই যে পাঠের অভিজ্ঞতা এটা আমাদের শেখায় যে বিকল্প ইতিহাস লেখার একটা ধারা কিন্তু তৈরী হতে পারতো। কিন্তু, প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চা সর্বদা তার 'মেথোডলজি', 'হিস্টোরিওগ্রাফিকে' তুষ্ট করে ইতিহাস লেখার গতিতেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই যে ইতিহাস জানছি, তার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতি গুলোর অনুমতি ক্রমে আমরা জানতে, চিনতে বা বুঝতে পারি। অর্থাৎ, এক ধরনের অসীম বিশ্বের ধরাধামে, আমাদের জানবার হাতিয়ারগুলো কিন্তু সসীম এবং নির্দিষ্ট দিকে সীমাবদ্ধ। সুতরাং, আমরা গবেষকরা, এই যে অবিমিশ্র ভাবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই, তাদের কাছে অভিজ্ঞতাটি একইসঙ্গে অদ্ভুত এবং খাপছাড়া ভাবে অপ্রত্যাশিত। সুতরাং এখানে একটা দাগ কাটা যায় যে, আমাদের জানার পদ্ধতি আমরা জ্ঞাতব্য জ্ঞান থেকে আলাদা করতে পারি। অর্থাৎ, জানার পদ্ধতি এখানে সীমাবদ্ধ কতকগুলো প্রনালী মাত্র; অন্যদিকে জ্ঞান আহরন করার বিশ্ব কিন্তু প্রকৃতিগত ভাবে অসীম। তাই এই দুটো আলাদা করা বাঞ্ছনীয়। এই গোলকধাঁধায় পড়ে হুসার্ল এর স্মরণ নেওয়া যেতে পারে। হুসার্লের মতে ব্যক্তি যে জ্ঞান আহরণ করছে তার দ্বারা সে যেন পুনরায় এইটা বোঝার চেষ্টা করে যে সে কোন পথে জানলো। অর্থাৎ, জ্ঞানের বৈতরণী পার হওয়াটাই শেষ কথা না, বরঞ্চ যেভাবে বা যে পদ্ধতি মেনে পর হলাম সেইটার উৎস মুখ বোঝা জরুরি। কিন্তু, বাস্তবিক আমাদের সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রতিনিয়ত সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি আমরা পালন করে আসছি। আমাদের সিলেবাসের খাঁচা অনুযায়ী আমরা আগে রিসার্চ মেথডলজির কিছু চর্বিত চর্বণ করে ক্ষেত্রে (ফিল্ডে)নামি। অর্থাৎ, এখানে এতাবৎ অধরা জ্ঞান এবং সেটি আহরণের পদ্ধতির যে বিভাজন তার সম্ভবনাকে শুরুতেই নস্যাৎ করে দিচ্ছি।

তৃতীয় গল্পটি জাতীয় নাগরিক পঞ্জী নবীকরন(এনআরসি)সংক্রান্ত। উত্তর পূর্ব ভারতের আসামের গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষক প্রবজনের লম্বা ইতিহাস আছে। যখনই একটু নিচু অঞ্চল জলমগ্ন হয় তখনই কৃষক গোষ্ঠী আরো উঁচু জায়গায় চলে যায়। এই অভিবাসনের যে লম্বা ইতিহাস এটির বিরুদ্ধে অসমের মানুষ প্রথম প্রতিবাদ শুরু করেন গত শতাব্দীর গোড়ায়। অভিবাসন বিরোধী আন্দোলন নানান রূপে অসমের বুকে দেখা গেছে। এই আন্দোলনের

সাম্প্রতিক ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল অবধি। এই পর্যায়ের আন্দোলনের মূল উদ্দ্যেশ্য গুলি ছিল, (১) বিদেশিদের চিহ্নিত করা, (২) তাদের থেকে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া, (৩) তারপর অসম থেকে তাদের বিতাড়ন করা। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধীর পৌরোহিত্যে অসমে আসাম চুক্তি (অ্যাকর্ড) সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অসমে প্রথম বারের মত নাগরিকপঞ্জি বা ন্যাশনাল রেজিষ্টার অফ সিটিজেনস্ তৈরী হয়। ১৯৮৫ সালে যে এই নগরিকপঞ্জি নবীকরণের যে চুক্তি হলো এই নিয়ে ২০০৬ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা হয়। যত দ্রুত সম্ভব এই নবীকরণ প্রক্রিয়া যাতে সম্পন্ন হয় তার সাপেক্ষেই এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা খরচ হয়ে যায় এবং পুরো আসাম প্রশাসন স্তব্ধ হয়ে যায়। ২০১৮ সালে, রাষ্ট্রীয় বর্জনির্ঘোষের মত অনেক খসরার পরে নাগরিক পঞ্জি আছড়ে পড়ে অসমের বুকে। প্রায় ১৯ লক্ষের বেশি মানুষ বেনাগরিক হয়ে যান। এই পর্যায়ে এশিয়ার বৃহত্তম ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরী হয় গোয়ালপাড়াতে। দুর্ভাগ্যের আরো কিছু বাকি ছিল। এতো বেশি মানুষ নাগরিক পঞ্জির বাইরে ছিলেন যে স্থান অসংকুলান হয়ে উঠলো। তাই, প্রশাসন এই উদ্বৃত্ত বেনাগরিক জনগণকে স্থানীয় জেলের নাম বদল করে তাদের জায়গা দেয়। যদিও ডিটেনশন ক্যাম্প কিন্তু জেল নয়। স্বয়ং আদালতের রায় আছে যে রাষ্ট্র যন্ত্র কিছুতেই ডিটেনশন ক্যাম্প কে কারাগারের মতো ব্যবহার করতে পারবে না। এরকম একজন বেনাগরিক হলেন দুলালচন্দ্র পাল। তিনি মানসিকভাবে স্থিতিশীল নন। তাঁর পরিজনরা নাগরিক পঞ্জীর আয়তায় এলেও তিনি আসেন নি। আসামে নাগরিকপঞ্জী কে কেন্দ্র করে দীর্ঘ আত্মহত্যার ইতিহাস রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি এই রাষ্ট্রীয় যাতনা সহ্য করতে পারলেন না। তেজপুর ডিটেনশন ক্যাম্পে দুলাল চন্দ্র পাল এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টাতেই অসুস্থ হয়ে পরেন। সেখান থেকে তাকে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে সুস্থতার জন্য নিয়ে আসা হলো। কিন্তু দীর্ঘ চিকিৎসার পরেও তিনি মারা যান। এখন মৃত্যুর পর দুলাল চন্দ্র পালের দেহ এবং তার রাষ্ট্রীয় পরিচিতি নিয়ে রাজনীতি শুরু হলো। প্রশাসন যখন পাল পরিবারকে দেহ দিতে আসলো শেষ কৃত্যর জন্য তখন পাল পরিবার দুলালবাবুর দেহ নিতে অস্বীকার করেন। পরিবার উল্টে প্রশাসনকে বলে যে যেহেতু রাষ্ট্র তাকে চিহ্নিত করেছে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে তাহলে তার দেহ বাংলাদেশে পাঠানো হোক। সর্বানন্দ সোনোয়াল তখন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাছে তখন এই মৃত বেনাগরিকের দেহ নিয়ে দিশেহারা। প্রশাসন এই অবস্থা সামাল দিতে একটি বিশেষ কমিটি তৈরী করা হলো যাতে সেই কমিটি যেভাবেই হোক পাল পরিবারকে দিয়ে মৃত দেহর শেষ কৃত্য করাতে সক্ষম হয়। কিন্তু মৃতের পরিবার রাষ্ট্র যন্ত্রের মতোই একবগ্গা। তাঁরা উল্টে প্রশাসনকে চাপ দিতে থাকলেন যাতে দুলাল বাবুর দেহ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় সর্বানন্দ সোনোয়ালের প্রশাসন এক প্রকার বাধ্য হয়ে দুলালবাবুকে মরণোত্তর নাগরিকত্ব দিলো।

দুলাল চন্দ্র পাল আমাদের বয়ানে জন্মের সূত্রে বা বসবাসের সূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার পাশাপাশি মরণোত্তর

নাগরিকত্ব পেলেন। লক্ষ্য করার বিষয় এখানে যে আইনের বলে রাষ্ট্র বলীয়ান হয়ে দুলালবাবু কে বেনাগরিক বলে দাগিয়ে দিলো সেই আইনের খেলাতেই রাষ্ট্র পর্যদুস্ত হয়ে বাধ্য হলো পুনরায় দুলাল চন্দ্র পাল কে ভারতের একজন নাগরিক হিসাবে মেনে নিতে।দুলালচন্দ্রের পরিবার রাষ্ট্রকে তার 'খেলা'র নিয়ম মেনেই 'খেলা' ভাঙ্গতে বাধ্য করলেন।

শেষ যে গল্পটি আলোচনা করা হলো তাতে দেখা গেলো, এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে পর্যুদস্ত করবার মতো রাজনীতির উৎস কিন্তু সেই তত্ত্বই।ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের বোর্দু তাঁর লজিক অফ প্র্যাকটিস বইতে এই যে তত্ত্বের যে প্রভাব তার থেকে উত্তরণ বা সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসার এই যে মুহূর্ত একেই অভিহিত করেছেন, 'escaping theorising effects' (Bourdieu,1992)। এই বিখ্যাত ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক নিজে কলেজ দে ফ্রান্সে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং পরে Classification Struggles (Bourdieu,2019) নামে যে পাঁচ খন্ডের বক্তৃতমালা প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে তিনি নিজের উপরে তত্ত্বের যে প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে এই নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। অন্যদিকে escaping theorising effects হলো এই যে তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগ বিশ্বে যে মধ্যবর্তী কালীন অংশের আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছিল এই আলোচনা সেই মুহূর্তের যাপনে নয়। আবার অন্যদিকে সেই মুহূর্তের প্রায়োগিক ফলাফলও নয়। বরঞ্চ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে, একজন সাধারণ জনগণ তত্ত্বের অন্তর্বর্তী বিশ্বের অংশও হলেন না আবার মুহূর্তের বাইরেও অবস্থান করলেন না। শেষত, এই বিষয়ে বিশদে সমাজবিজ্ঞানের ধারায় এখনো সেরকম কাজ হয়নি। বাংলায় তো একেবারেই নয়।

টীকা

১. পুরাতন নিয়মে (Old Testament) লেভিয়াথান বলতে একটি বহু মাথা সম্পন্ন সামুদ্রিক দানবকে বোঝানো হয়েছে। হবস পরবর্তী কালে সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব থেকে যে আধুনিক রাষ্ট্রের কাঠামো নির্মাণ করেন, সেটিকে তিনি তুলনা করেছেন লেভিয়াথানের সঙ্গে।

২. সাম্প্রতিক কালের কাজগুলির মধ্যে মাধব খোসলা এবং রোহিত দে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন।

৩. লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন প্রসঙ্গে এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং চেতনা সম্পন্ন সংগ্রামের মধ্যে এই পার্থক্যটি টেনেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতন সত্তাকে স্বতঃস্ফূর্ততা যেভাবে গ্রাস করে ফেলে, সেই বিপদ নিয়ে তিনি বিশদে আলোচনা করেছেন। (লেনিন, ১৯৫৫)

৪. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ একজন প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এবং পরিবেশকর্মী, পূর্ব কলকাতা জলাভুমি সংরক্ষন নিয়ে তাঁর আন্দোলন স্মরণীয়। পূর্ব কলকাতা জলাভূমির মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদদের জ্ঞানের আদান প্রদান প্রসঙ্গে যে অসাম্য উঠে এসেছিল সেই প্রসঙ্গে তিনি 'subaltern knowledge apartheid', শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

1) Bourdieu, P. (2019). Classification Struggles:General Sociology (Vol. I). Polity .

2) Bourdieu, P. (1992). The Logic of Practice. (R. Nice, Trans.) Stanford University Press.

3) Guru, G., & Sarukai, S. (2012). The Cracked Mirror: An Indian Debate on Experience and Theory. Oxford University Press.

4) Nancy, J.-L. (2000). BEING SINGULAR PLURAL. (R. D. Richardson, & A. E. O'Byrne, Trans.) Stanford, California: Stanford University Press.

5) মুখোপাধ্যায়, ভ. (2014). সপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস. চর্চাপদ.

6) রায়, স. (২০১৮). আবোল তাবোল. আনন্দ পাবলিশার্স.

7) লেনিন, ভ. আ. (১৯৫৫). কী করিতে হইবে. কলকাতা: এনবিএ প্রাইভেট লিমিটেড.